Vol. 28 | No. 3 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বিধবা বিবাহ ও বঙ্কিমচন্দ্র

Volume	28
Issue	3
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাহমুদা খাতুন
Published online	June 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i3.5
Pages	148-163
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বিধবা বিবাহ ও বঙ্কিমচন্দ্র

মাহমুদা খাতুন

বালিকা কন্যার অকাল-বৈধব্যে বঙ্গভূমি কতকাল থেকে ক্রন্দন করেছিল? সে ক্রন্দন কতটা আন্তরিক ছিল?

বিধবা-বিবাহ আন্দোলন কালে, ১৮৫৫ সালে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহ বিষয়ক তাঁর দ্বিতীয় পুস্তিকাতে এদেশের মানুষকে ধিক্কার দিয়ে লিখেছিলেন—"তোমরা মনে কর পতি বিয়োগ হইলেই, স্ত্রীজাতির শরীর পাষাণময় হইয়া যায়; দুঃখ আর দুঃখ বলিয়া বোধ হয় না, যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা বলিয়া বোধ হয় না, দুর্জ্জয় রিপুবর্গ এক কালে নির্ম্মূল হইয়া যায়। কিন্তু তোমাদের এই সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তিমূলক, পদে পদে তাহার উদাহরণ প্রাপ্ত হইতেছ। ভাবিয়া দেখ, এই অনবধান-দোষে সংসার তরুর কি বিষময় ফল ভোগ করিতেছ। হায় কি পরিতাপের বিষয়! যে দেশে পুরুষ জাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায় অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিত বোধ নাই, সদসদ্বিবেচনা নাই; কেবল লৌকিক রক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম; আর যেন সে দেশে অবলা-জাতি জন্মগ্রহণ না করে।

হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া, জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না।"[১]

নবজাগ্রত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, নিজ ধর্মের নানা আচার ও কর্মের প্রতি বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন ও উদার মানবপন্থী বলে কথিত উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু-সমাজ এই তীব্র তিরস্কারের পরেও কিন্তু বিধবা-বিবাহ আন্তরিক ভাবে গ্রহন করেনি। ৯৩৬ জনের স্বাক্ষর-সম্বলিত বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহের আবেদন-পত্রটির জবাবে

আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু-সমাজ সাঁইত্রিশ হাজার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পাল্টা আবেদন পত্রে সরকারকে জানায় হিন্দুজাতি বিধবার বিবাহ চায়না। ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশের পরে যথার্থই কি বিধবা-বিবাহের প্রচলন হয়েছিল? বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহকে নিজ জীবনের 'সর্বপ্রধান সৎকর্ম' জ্ঞান করে নিজ পুত্র নারায়ণচন্দ্রের বিধবার সাথে বিবাহ দিয়েছেন, নিজ চেষ্টা ও অর্থ ব্যয়ে কিছু সংখ্যক বাল-বিধবার বিবাহও ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু হিন্দু-সমাজ বিধবা কন্যা ও ভগ্নীর দুঃখ-মোচনে তাঁর এই প্রচেষ্টাকে কৃতার্থতার সাথে মাথায় তুলে নিয়েছিল কি? শেষ জীবনে তাঁকে আবার ক্রোধে, ক্ষোভে বিধবা-বিবাহের প্রতি-বাদীদের জবাব দিতে হয়েছে, আবার বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয় সমর্থন প্রমাণ করতে হয়েছে। বিধবার বিবাহকে সমাজ গ্রহণ করেনি, ভগ্ন-হৃদয় ঈশ্বরচন্দ্র ঋণভারে জর্জরিত হয়েছেন মাত্র। আইন পাশ হয়ে যাওয়ার পরও অসহায় বিধবারা 'কি পাপে ভারতবর্ষে আসিয়া' জন্ম-গ্রহণ করেছে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে খুঁজে যন্ত্রণাময় জীবন কাটিয়ে দিয়েছে। পরম আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, বিধবা বিবাহ, ১৮৫৬-র পরে, বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশায়,— এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক-গুলিতেও সমাজ-জীবনে সম্মানিত প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি।

অথচ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বহু পূর্বেই, এদেশে বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অকাল-বৈধব্য। বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের একশত বৎসর পূর্বেই ব্যক্তিগত প্রভাবে বিধবার বিবাহ দেবার চেষ্টা করা হয়েছিল। অবশ্য সেটা পারিবারিক সমস্যাই ছিল, সামাজিক আন্দোলন নয়। ১৮১৫ সালে রামমোহন রায় 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন কলকাতা শহরে। এই সভায় তাঁর আগ্রহী ও উদারমনা বন্ধুদের মধ্যে যে সকল সামাজিক প্রথার বিরূপ সমালোচনা করা হত, বাল্যবিবাহ ও বাল্যবৈধব্য তার অন্যতম। রামমোহন রায় জাতিভেদ প্রথা ও পৌত্তলিকতার সমস্যার সঙ্গে বিধবার সমস্যা নিয়েও ভেবে-ছিলেন, দেখা যায়। ডিরোজিও-গঠিত 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন'-এর বৈঠকেও এই সামাজিক সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা ও বিতর্ক হত।

তিরিশের গোড়া থেকেই ইয়ং বেঙ্গলের দল এই ধরনের সব সামাজিক সমস্যার সমাধান খুঁজতে থাকে

তিরিশের আন্দোলনের ফলে ভারতীয় ল কমিশন বাল-বিধবাদের পুনর্বিবাহের বিষয়টি বিশেষভাবে বিচার-বিবেচনা করে আইন প্রণয়নের জন্য সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়। কিন্তু ১৮৩৭ সালের ল কমিশনের রিপোর্ট বিধবা-বিবাহের প্রতিকূলে যায়— দুটি কারণে (১) বিধবা-বিবাহ প্রচলন হলে সামাজিক ও জাতিগত প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে, (২) এই আইন পাশ হলে হিন্দুর দায় ভাগ (Law of Inheritance)-এর ভিত্তি নড়ে উঠবে। H. D. Harrington, একজন ইংরেজ রেজিস্ট্রার কর্তৃপক্ষকে যে রিপোর্ট পাঠান, তা অত্যন্ত কৌতুককর—"হিন্দু পরিবারে নারীর যে বিশেষ স্থান ও মর্যাদা আছে, তার গুরুত্ব তাদের কাছে অত্যন্ত বেশী। হিন্দু বিধবাদের দুঃখ-কষ্টকে তাঁরা পীড়াদায়ক বলে মনে করেন না। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা, নীতি ও ধর্মরক্ষার জন্য এইটুকু কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকার করা প্রত্যেক হিন্দু বিধবার অবশ্য কর্তব্য। বিধবারা পুনর্বিবাহ করলে হিন্দু শুধু যে শাস্ত্রীয় অনুশাসন লঙ্ঘন করা হবে, তাই নয়, সমাজের চোখে যে বিধবারা তা করবে, তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হবে। এই জন্য এই বিষয়ে কোন আইন পাশ করার যথেষ্ট গুরুদায়িত্ব আছে। মানবিক কর্তব্যের দিক থেকে আইন পাশ করলে নিঃসন্দেহে ন্যায়সঙ্গত কাজই করা হবে; কিন্তু হিন্দু-শাস্ত্র ও হিন্দু-আইনের দিকে লক্ষ্য রেখে তা করলে জনসাধারণের অনুভূতিকে নির্দয় আঘাত করা হবে।"[২] অনুরূপ আর একজন ইংরেজ রেজিস্ট্রারের মন্তব্য— "হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা না থাকার ফলে সমাজে যে নানা রকম কুফল দেখা দিচ্ছে, সে-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়েও কোর্টের মত এই যে এই ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য কোন আইন পাশ করা হলে তা ভারত সরকারের দিক থেকে জনসমাজের কাছে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করা হবে।"[৩]

দেখা যাচ্ছে, ল কমিশন বিধবা-বিবাহের মানবিক দিকটি অস্বীকার না করলেও প্রত্যক্ষভাবে হিন্দুর সামাজিক ও ধর্মীয় আদর্শে আঘাত করতে চায়নি। ইংরেজ সরকারের এই 'আগে আপনি বাঁচো' নীতি

সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার কালেও অনুভব করা গিয়েছিল। ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হবে—এই অজুহাতে জীবন্ত নারী পুড়িয়ে মারা প্রত্যক্ষ করেও তারা প্রথমে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায়নি। ইংরেজের শাসননীতির মূল লক্ষ্য ছিল নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা—তাই সতীদাহ, বাল-বিবাহ, বহু-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ—এই সব কুপ্রথা ও সমস্যার কোন সমাধানই তাদের কাছে পাওয়া যায়নি। তবু, ১৮৩৭-৩৮এ ভারতীয় ল কমিশন বিধবা-বিবাহের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা করেছিল, বিধবা-বিবাহের আইন প্রণয়নের প্রশ্ন বিবেচনা করেছিল, এর ফলে সমাজের বিভিন্ন স্তরে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন-আলোচনা ছড়িয়ে পড়েছিল—এটা অস্বীকার করার পথ নেই। ইয়ং-বেঙ্গলরা এই সময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৮৪২ সালেই খোলাখুলি ভাবে ইয়ং-বেঙ্গল দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' বিধবা-বিবাহকে সমর্থন জানায়। বিধবা-বিবাহকে কেন্দ্র করে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বহু দল ও মতের সৃষ্টি হয়। এদের মধ্যে ইয়ং-বেঙ্গল ও ধর্মসভা বিধবা-বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষে চরমপন্থী, ব্রাহ্ম-সমাজ মাঝামাঝি উদারপন্থী ছিল বলে ধারণা করা হয়।

প্রথমে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করেন। বিদ্যাসাগরের পূর্ব পর্যন্ত বিধবা-বিবাহকে কেন্দ্র করে বাদানুবাদ ও আন্দোলন চলেছে কিন্তু বিধবা-বিবাহকে বাদানুবাদ থেকে প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টার স্তরে তিনিই উন্নীত করেন, এবং আন্দোলন সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়। ১৮৫৫ সালে তিনি 'বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' নামে দুটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন, এবং বিধবা-বিবাহ যে অ-শাস্ত্রীয় নয়, শাস্ত্রবচন উদ্ধার করে একথাও প্রমাণ করেন। বিদ্যাসাগরের জন্য শুদ্ধ মানবিক কারণই বিধবা-বিবাহের জন্য যথেষ্ট ছিল, কিন্তু মূঢ়, দেশাচারবদ্ধ দেশবাসীর জন্য তাঁকে শাস্ত্র-সমর্থনও উদ্ধার করে আনতে হয়েছে। একজন টিপিকাল হিইম্যানিস্ট-এর মতই বিদ্যাসাগর মানবপ্রধান জীবনাদর্শের ভিত্তি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। যুক্তিনির্ভর মানবিক আবেদন দিয়েই তিনি ১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ করান।

কিন্তু বিধবা-বিবাহ সমাজের সর্বস্তরে সমাদৃত হয়নি। কেন? বিরোধিতা কারা করেছিলেন, শুধু কি রক্ষণশীলেরাই? যাঁরা প্রকাশ্যে বিধবা-বিবাহকে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তারাও প্রয়োজনে সক্রিয় সহযোগিতা থেকে পিছিয়ে রইলেন। রামমোহন রায়ের পুত্র প্রতিশ্রুত সাহায্য প্রদানে অস্বীকৃত হলে, বিদ্যাসাগর কি ক্রোধে ক্ষোভে দেয়ালে টাঙ্গানো রামমোহনের ছবি দেখিয়ে বলেননি---'এটা তবে আর রেখেছো কেন, এটা ফেলে দাও?' অসঙ্গতি ও স্ববিরোধ উনবিংশ শতাব্দীর নবীন-চেতনায় প্রথমাবধিই ছিল। প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল ধারণা সাদা-কালো রঙে কোন ব্যক্তি-বিশেষকেই শেষ পর্যন্ত চিহ্নিত করে রাখতে পারেনি। কারণ উনবিংশ শতাব্দীর নবীন প্রেরণায় শুধু সংস্কার ও ও পরিবর্তনই কাম্য হয়নি, আত্ম-মর্যাদা ও ঐতিহ্যবোধের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষাও স্বাভাবিক ভাবেই এসেছিল। রাম-মোহন রায় নব-জাগরণের প্রথম পুরুষ—একব্রহ্ম-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে তিনি প্রচলিত হিন্দুধর্মের মূলে কুঠারাঘাতই করেছিলেন;—অথচ খ্রীষ্টান মিশনারীদের হিন্দুধর্ম আক্রমণের তীক্ষ্ণ উত্তর তাঁর কাছ থেকেই এসেছে। ভবাণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই প্রখরভাবে নিজ সমাজের অনাচারকে তুলে ধরেছেন, কিন্তু ব্যক্তির বিশ্বাস ও বোধে তাঁকে রক্ষণশীলই বলতে হয়। ঈশ্বর গুপ্ত একজন সমাজ-সচেতন সাংবাদিক ও কবি হয়েও স্ত্রী-শিক্ষা অথবা বিধবা-বিবাহকে নিয়ে বিষোদ্‌গার করেছিলেন—এ কি আমাদের কম বিস্মিত করে? ব্রাহ্ম সম্প্রদায়কে ধরা যাক— স্ববিরোধিতা তাঁদেরও ছিল! দেবেন্দ্র-নাথ ঠাকুরের, ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও, উপবীত ধারণের পক্ষে মত ছিল। উপাসনা সভার পৌরহিত্যের অধিকার শুধু ব্রাহ্মণকেই দিতে চেয়েছেন তিনি, বিধবা-বিবাহকে অন্তর থেকে সমর্থন করেননি কখনো। হিন্দু সমাজ ব্রাহ্মদের স্বধর্ম ত্যাগী বলে জানত, কিন্তু কেশব সেন যখন বললেন---'The term Bramho does not include Hindu'—তখন পৌত্তলিক হিন্দু-সমাজে ঝড় ওঠার কোন কারণ ছিল কি? যার জন্য পরবর্তী কালে ঘোরতর ব্রাহ্ম রাজনারায়ণ বসু নিজে এবং হিন্দুদের সন্তোষ বিধান করে শেষ কথাটি জানালেন---'ব্রাহ্মধর্ম উন্নত হিন্দুধর্ম।' কেশব সেন 'আদি ব্রাহ্ম সমাজ' থেকে বেরিয়ে এসে

প্রগতিশীলতা প্রচারের উদ্দেশ্যে 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম' সমাজ স্থাপন করলেন, 'তিন আইনের বিয়ের' মধ্যে মানবচিন্তার পরাকাষ্ঠা দেখালেন, অথচ নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন হিন্দু মতে, এবং শেষ জীবনে ভক্তি ধারায় নিজে প্রায় বৈষ্ণব হয়ে দাঁড়ালেন। ভাবা যায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের পড়ার অধিকার অবারিত হলে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিল উদারপন্থী ব্রাহ্ম সমাজই? সুতরাং এই শতাব্দীর মানুষের চিন্তায় বিরোধ ও অসঙ্গতি ছিল। এর কারণও নিহিত ছিল নবীন-চেতনার মধ্যেই। মানববাদকে অবলম্বন করে এই নবীন-চেতনা অবশ্যই পরিবর্তনকামী ছিল প্রধানভাবে, কিন্তু এই সাথে আত্মমর্যাদা ও ঐতিহ্যবোধের জাগরণও নিঃসন্দেহে ঘটেছিল। বিদ্রোহী চিন্তা-চেতনা যখন ধর্ম, দেশাচার ও ঐতিহ্যকে আঘাত করে, তাকে রক্ষা করার জন্য শুধু রক্ষণশীল দলই উদ্গ্রীব হলেন না, প্রতিটি হিন্দুই সেই প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। পুরো উনবিংশ শতাব্দীতেই এই মিশ্র চেতনা বজায় ছিল, তবু প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষার প্রাধান্য ছিল, আর শেষ অংশে রক্ষা করার প্রবণতা। এই সূত্র ধরেই উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নব্য হিন্দুত্বের বিকাশ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ে হিন্দু-ধর্ম ও হিন্দু-জাতীয়তার সংরক্ষণ ও বিকাশের দায়িত্ব নিয়ে এই পর্যায়ের প্রধান পুরুষ হয়ে দাঁড়ান!

বঙ্কিমচন্দ্রকে বিধবা-বিবাহের একজন প্রধান সমালোচক হিসাবে গণ্য করা হয়; তিনি গভীরভাবে ঐতিহ্যবাদী ছিলেন বলে হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। তিনি চিন্তা ও চেতনায় রক্ষণশীল ছিলেন, হিন্দু ধর্ম ও জাতির নব-জাগরণ তাঁর জীবনের প্রধান কামনা ছিল। সুতরাং বিতর্কিত বিধবা-বিবাহ তাঁর সমর্থন পাবে না, এমন কথা অনুমান করা হয়েছে, এবং তাঁর লেখা থেকে এ-ধারণার অনুকূলে সাক্ষ্য-প্রমাণও সংগ্রহ করা হয়েছে প্রচুর। রক্ষণশীল হিন্দুমাত্র আপনার বিধবা ভগ্নী অথবা কন্যার বিবাহ দিতে চায়নি; আর বঙ্কিম, যিনি নব্য হিন্দুত্বের শিক্ষক, তিনি কি করে হিন্দু বিধবার পুনরায় পতি গ্রহণকে সমর্থন জানান? এরকম একটা সন্দেহ বঙ্কিমকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল। বঙ্কিম রক্ষণশীল ছিলেন, কিন্তু কতটা

রক্ষণশীল? যে কঠোর, নীতিবাদী জাতির শিক্ষক হিসেবে বঙ্কিমের পরিচয় তুলে ধরা হয়, বস্তুতঃ কি তিনি ততটাই শুষ্ক, ততটাই কঠোর? বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে সত্যই কি তিনি ধর্মের অনুরোধে একান্ত সহানুভূতিহীন? বঙ্কিমের হিন্দুধর্মের প্রকৃত স্বরূপ কি? বিধবা-বিবাহকে বঙ্কিম কি দৃষ্টিতে বিচার করেছেন, এই বিচারে যাবার পূর্বে বঙ্কিমের ধর্মমত সম্পর্কে কিছু তথ্য পরিষ্কার করে বলা দরকার।

বঙ্কিমচন্দ্র গোঁড়া হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, এবং সনাতন ধর্মের আওতাতেই লালিত হন। বাল্যকাল থেকে ধর্মীয় পরিবেশে বড় হওয়াতে ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রভাব তাঁর জীবনে অনস্বীকার্য। কিন্তু তাঁর পরিণত জীবনের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি বুদ্ধির আলোকেই ধর্মের উপযোগিতা বিচার করার চেষ্টা করেছেন। সমকালীন পরিবেশ এই অনুসন্ধিৎসার অনুকূল ছিল—কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জীর খ্রীস্ট ধর্মানুরাগ; দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন, রাজনারায়ণ বসুর ব্রাহ্মধর্ম; আর্য সমাজ ও শশধর তর্কচূড়ামণির সনাতন হিন্দুধর্ম তাঁকে অবশ্যই কৌতূহলী ও জিজ্ঞাসু করে তুলেছিল। পাশ্চাত্য ভাবধারায় পুষ্ট ও প্রথম জীবনে বিশেষভাবে তার পক্ষপাতী হয়েও শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু শাস্ত্র-গ্রন্থ শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় তাঁর 'স্বধর্ম'কে ফিরে পেলেন; 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'কৃষ্ণ চরিত্র'-এ তাঁর ধর্মের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু-ধর্মকেই জগতে সম্পূর্ণ ধর্ম বলে জ্ঞান করতেন। তাঁর সিদ্ধান্তের কারণ এরকম—"ধর্ম যদি যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের সর্বাংশই ধর্ম কর্তৃক শাসিত হওয়া উচিত। ইহাই হিন্দু ধর্মের প্রকৃত মর্ম্ম। অন্য ধর্ম্মে তাহা হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ। কেবল হিন্দু ধর্ম্ম সম্পূর্ণ ধর্ম্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত জীব, সমস্ত জগৎ—সকল লইয়া ধর্ম্ম। এমন সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ব সুখময় পবিত্র ধর্ম্ম কি আর আছে?"[৪] বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সার্থক, সত্য সুসঙ্গত জীবনাচরণই ধর্ম। হিন্দু-ধর্মে ব্যক্তির আচরণের যে নির্দেশ আছে, ব্যক্তি, সমাজ, স্বজাতি, পরজাতি সমস্যা সমাধানের যে ইঙ্গিত আছে, এমন আর কোন ধর্মে নাই,—একথা বঙ্কিম মনে-প্রাণে বিশ্বাস

করেন। কিন্তু তাঁর এই বিশেষ হিন্দু-ধর্মের সাথে সঙ্কীর্ণ দেশাচার ও লোকাচার সমৃদ্ধ হিন্দু-ধর্মের কোন মিল ছিল কি? বঙ্কিমের হিন্দুত্বের এই আদর্শ সাধারণ হিন্দুর কল্পে সাধ্য ছিল—কারণ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বলাভই বঙ্কিমের ধর্ম-আচরণের মূল লক্ষ্য, সেখানে কোন ফাঁকি ছিল না। তাঁর হিন্দুত্বের আদর্শ সর্বদাই ব্যক্তির চরিত্র-শক্তিতে ও ত্যাগে মহান—তাই রক্ষণশীল সাধারণ হিন্দু বলতে যা বোঝায় বঙ্কিম তা ছিলেন না। ধর্মের লৌকিক আচরণসমূহ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় একান্তই অনুপস্থিত। সুতরাং 'বঙ্কিমচন্দ্র রক্ষণশীল ছিলেন' একথা উচ্চারণ কালে, তাঁর বিশেষ ধর্মবোধটি, তার স্বরূপ মনে রাখা আবশ্যক। একজন সাধারণ রক্ষণশীল হিন্দু ও রক্ষণশীল বঙ্কিমচন্দ্রে তফাৎ অনেক। তবু একটি প্রশ্ন থাকে। বঙ্কিমচন্দ্রেও কি স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় না? একই সাথে ঐতিহ্যবাদিতা ও প্রগতিশীল চেতনা তাঁর মানসেও সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। জীবনের নির্মোহ বিশ্লেষণ তিনি দিতে চেয়েছিলেন, তবু মোহ থেকে গেছে, দৃষ্টিকে করেছে পশ্চাদমুখী। এটি বঙ্কিমের শিল্পী-মানসের দ্বন্দ্ব, একে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে তিনি কি ভেবেছিলেন, তিনি তো শুধু জাতির শিক্ষকই ছিলেন না, ছিলেন সংবেদনশীল শিল্পীও। বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে কি রায় দিয়েছিলেন তিনি? বিদ্যাসাগরের সাথে তাঁর মতবিরোধিতার কথা সকলেরই জানা, তিনি তাঁর দুটি সামাজিক উপন্যাসে বিধবার বিবাহ ও প্রেমাকাঙ্ক্ষার শোচনীয় পরিণাম প্রদর্শন করেছেন, সেজন্য আমরা সহজেই ধারণা করি বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহ সমর্থন করেননি। কিন্তু এ বিচার সঠিক কি?

বিধবা-বিবাহ, বঙ্কিমের মতে, উচিত কি অনুচিত, এই বিতর্কে যাবার আগে দাম্পত্যসম্পর্ক-বন্ধন সম্পর্কে বঙ্কিমের কি অভিমত, তা জানা দরকার। পরিবারকেন্দ্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় এদেশে দাম্পত্য-সম্পর্কের মূল অত্যন্ত গভীর। নৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসনের ফলে দাম্পত্য-বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় এখানে। বঙ্কিমের মতে দাম্পত্য বন্ধন অতি পবিত্রও, স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা ধর্মীয় আচরণ। বঙ্কিমের নিজের দাম্পত্যজীবন অত্যন্ত সুখের ছিল। জীবনসঙ্গিনী রূপে স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী

সুখে-দুঃখে, আপদে-বিপদে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান সহায় ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে পরবর্তী কালে তিনি বলেছেন—"আমার জীবন অবিশ্রান্ত সংগ্রামের জীবন। একজনের প্রভাব আমার জীবনে বড় বেশী রকমের-আমার পরিবারের। আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়। তিনি না থাকিলে আমি কি হইতাম বলিতে পারি না।"[৫] সুখী পরিতৃপ্ত দাম্পত্যজীবনের অধিকারী ছিলেন তিনি। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা ও সম্মানবোধ বঙ্কিম-মানসের একটি বিশেষ চেতনা গড়ে তুলেছিল মনে হয়। পবিত্র দাম্পত্যবন্ধনের মধ্যে স্ত্রীকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখেছেন তিনি, তাঁর মতে স্ত্রী 'বাল্যের ক্রীড়াসঙ্গিনী', 'যৌবনে সংসার সৌন্দর্য্যের প্রতিমা', 'বার্দ্ধক্যে জীবনাবলম্বন'[৬]; এই স্ত্রীর সাথে জীবনে-মরণে সম্পর্ক অচ্ছেদ্য। দাম্পত্য সম্পর্কের পবিত্রতা রক্ষায় শুধু স্ত্রী নয়, পুরুষের একনিষ্ঠতাও যে প্রত্যাশিত—এই আধুনিক চেতনাকেও তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সম্মানে ও প্রেমে নিজের স্ত্রীকে যে উচ্চ আসনে তিনি অধিষ্ঠিত করেছিলেন, —তাঁর রচনায়ও নারীর সেই উচ্চলোকে অধিষ্ঠান। সুতরাং একথা ঠিক যে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু স্ত্রীর সনাতন পাতিব্রত্য ও সতীত্ব সংস্কারে বিশ্বাসী ছিলেন। এ বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য অপরিহার্য ছিল,—তবু বলা যায় বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি বিধবার পুনর্বিবাহের অধিকার স্বীকার করেছেন। তাঁর কাছে অবশ্যই সেই স্ত্রী আদর্শ নারী, যে স্বামীর স্মৃতিকে হৃদয়ে রেখে জীবনের শূন্যতাকে বহন করে প্রসন্ন চিত্তে। একে রক্ষণশীলতা বলা যায়—কিন্তু প্রেমের একনিষ্ঠতা সকল কালে সকল সমাজেই অভিনন্দিত। বঙ্কিম অন্ধ রক্ষণশীল ছিলেন না, বিশেষ ক্ষেত্রে বিধবার পুনর্বিবাহে তিনি আপত্তি করেননি। 'সাম্য' গ্রন্থে প্রকাশিত বিধবা-বিবাহের আলোচনাটির বিশেষ অংশের উপর জোর দিয়ে বলা হয়ে থাকে তিনি বিধবা-বিবাহের বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে বিধবার বিবাহের যে প্রয়োজন তা তিনি অস্বীকার করেননি, একথাটা আমরা মনে রাখি না। সকল নারীই স্বামীর মৃত্যুর পর বিবাহ করবে, একথাটা কি ঈশ্বরচন্দ্রই বলেছিলেন? তিনি যে বিধবা কয়টির বিবাহ দিয়েছিলেন, তারা সকলেই বাল-বিধবা, অপ্রাপ্তবয়স্কা।

'সাম্য' গ্রন্থটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র এদেশের স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে চারটি

প্রধান বৈষম্যের কথা উল্লেখ করেছেন—(১) স্ত্রীলোক শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত, (২) স্বামীর মৃত্যু হলে পুনর্বিবাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত, (৩) যথেচ্ছ গমনের অধিকার থেকে বঞ্চিত, (৪) পুরুষের মত যথেচ্ছ বিবাহের অধিকার থেকে বঞ্চিত। স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বঙ্কিমচন্দ্র অনুভব করেছিলেন। এই সম্পর্কে, সমাজের অবহেলা সম্পর্কে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন তিনি,—বলেছেন, হিন্দু-সমাজে এমন সব অভিভাবক রয়েছেন যাঁরা—"পুত্রটি এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইলে বিষপান করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই কন্যাটি কথামালা সমাপ্ত করিলে চরিতার্থ হন।"[৭] দ্বিতীয় ও চতুর্থ বৈষম্যের আলোচনা দীর্ঘতর। বিধবার পুনর্বিবাহের অধিকার প্রদান ও পুরুষের যথেচ্ছ বিবাহের অধিকার পরিহার করা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব প্রগতিশীলই বলা যায়। তিনি, প্রকৃতপক্ষেই, বিধবা-বিবাহের প্রতি বিদ্বিষ্ট ছিলেন, এ-ধারণা ঠিক নয়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সূর্যমুখীর বিদ্যাসাগর-সম্পর্কে উক্তি—'যে বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, মূর্খ কে?' অবলম্বন করেই বলা হয় বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা-বিবাহ অপছন্দ করতেন। মনে রাখতে হবে এ উক্তি সূর্যমুখীর, বঙ্কিমচন্দ্রের নয়। সূর্যমুখীর যে বড় জ্বালা, তারই স্বামী বিধবা-বিবাহ করতে চায়। তাই সে বিদ্যা-সাগরের উপর রুষ্ট। সূর্যমুখীর বেদনা কি বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন? এটিই সূর্যমুখীর অভিযোগ।

'সাম্যে' বিধবা-বিবাহ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের কিছু অংশ প্রথমে উদ্ধৃত করি—"কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রী শিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কিনা, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রী শিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোকের শিক্ষিত হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না। আমরা বলিব, বিধবা বিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে, সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহ হওয়ার অধিকার থাকা ভাল। যে স্ত্রী সাধ্বী, পূর্বপতিকে আন্তরিক ভালবাসিয়াছিল, সে কখনোই পুনর্ব্বার পরিণয় করিতে ইচ্ছা করে না; যে জাতিগণের মধ্যে

বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, সে সকল জাতির মধ্যেও পবিত্রস্বভাব বিশিষ্টা, স্নেহময়ী সাধ্বীগণ বিধবা হইলে কদাপি আর বিবাহ করে না। কিন্তু, যদি কোন বিধবা হিন্দুই হউন, আর যে জাতিই হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃপরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধিকারিণী।"[৮] বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন, স্ত্রী-শিক্ষা যেমন সর্বজনীন হওয়া আবশ্যক, বিধবা-বিবাহ তেমন নয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সকল বিধবার বিবাহ দিয়েছিলেন তারা অপ্রাপ্ত বয়স্কা, বাল-বিধবা—তাদের সমস্যা সরল, জটিলতাহীন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাপ্তবয়স্কা বিধবার কথা বলছেন, সুখী দাম্পত্য জীবন-যাপনের পরে সকল তরুণী বিধবা-বিবাহে সম্মত নাও হতে পারে। প্রেমে একনিষ্ঠতা সকল সময়েই প্রশংসনীয়, তাই স্বামীর স্মৃতিকে হৃদয়ে রেখে যে তরুণী বিধবারা পুনর্বিবাহে অসম্মত, বঙ্কিম তাদের পবিত্র স্বভাব-বিশিষ্টা, স্নেহময়ী ও সাধ্বী আখ্যা দিয়েছেন। বঙ্কিমের এই উক্তিটিই প্রধানতঃ তাঁর বিধবা-বিবাহ বিরোধের প্রধান সূত্র বলে গৃহীত হয়। "তিনি ঘোষণা করিতেছেন যে, যে বিধবা তাহার পূর্ব স্বামীকে ভালবাসিয়াছে, সে পুনরায় বিবাহ করে না। এই উক্তির মধ্যেই প্রচ্ছন্নভাবে বিধবা-বিবাহের প্রতি তাঁহার সহানুভূতিহীন মনোভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। অর্থাৎ কোন বিধবা যদি প্রকৃতই বাস্তবক্ষেত্রে তাহার বিবাহের অধিকার প্রয়োগ করে, তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের শর্তানুযায়ী তাহাকে কোন মতেই 'সাধ্বী' 'পবিত্র স্বভাব বিশিষ্টা' 'স্নেহময়ী' ইত্যাদি কোন বিশেষণেই ভূষিত করা যাইবে না। বরং সমাজ-ধর্ম তাহাকে বার বার স্মরণ করাইয়া দিবে যে সে তাহার পূর্ব স্বামীকে ভালবাসে নাই।"[৯] অরবিন্দ পোদ্দার এই বিচার সম্পূর্ণ সত্য নয়। সকল নারী সমান নয়। সূর্যমুখী অথবা ভ্রমর বিধবা হলে তাদের পুনর্বিবাহের প্রশ্ন উঠতো কি? তাদের স্বামী-প্রেম এতই প্রগাঢ়, এতই একাগ্র ও একনিষ্ঠ যে দ্বিতীয় বিবাহের কল্পনাও তাদের জন্য অসম্ভব। তারা অবশ্যই সাধ্বী, পবিত্র-স্বভাব বিশিষ্টা ও স্নেহময়ী। আসল কথা, একনিষ্ঠ প্রেম (বিবাহ-সাপেক্ষ অথবা নিরপেক্ষ) সর্বদাই দুঃখের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, সর্ব দেশে সর্ব কালেই তা প্রশংসা অর্জন করে থাকে, বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রশংসায় অধিক পরিমাণে উচ্চকণ্ঠ। আবার কুন্দনন্দিনীকে পুনরায় বিবাহের পরেও নিশ্চয়ই অসতী অথবা অপবিত্রা বলা যায়

না? কুন্দনন্দিনীর হৃদয়ে স্বামীর স্মৃতি মাত্র ছিল না—যৌবন উন্মেষ-কালেই তার চিত্ত নগেন্দ্রে সমর্পিত। সেই অর্থে কুন্দও সাধ্বী, পবিত্র-স্বভাববিশিষ্টা ও স্নেহময়ী। কিন্তু রোহিনী কুন্দ নয়, রোহিনীকে পবিত্র-স্বভাববিশিষ্টা বলা যায়না, তার অন্তরে প্রেম অপেক্ষা ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রবল। আসলে বঙ্কিম বলতে চেয়েছেন--প্রতিটি বিধবার সমস্যা এক নয়, সেজন্য ঢালাও ভাবে প্রতিটি বিধবার বিবাহ শুভ অথবা কল্যাণকর হতে পারে না। তবে অধিকার থাকা ভাল। সংসারে সূর্যমুখী অথবা ভ্রমর কয়জন আছে? সেজন্য, বঙ্কিম বলছেন—"যদি কোন বিধবা হিন্দুই হউন, আর যে জাতীয়াই হউন, পতির লোকান্তর পরে পুনঃ পরিণয়ে ইচ্ছাবতী হয়েন, তবে তিনি অবশ্য তাহাতে অধি-কারিণী। যদি পুরুষ পত্নী-বিয়োগের পর পুনর্ব্বার দারপরিগ্রহে অধিকারী হয়, তবে সাম্যনীতির ফলে স্ত্রী পতি-বিয়োগের পর, অবশ্য, ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার পতিগ্রহণে অধিকারিণী।"[১০] Greatest good for the greatest number উনবিংশ শতাব্দীর উদার মূল্যবোধ বঙ্কিমচন্দ্রে একেবারেই অস্বী-কৃত হয়নি। এটা কি পরম আশ্চর্যের কথা নয়, বাংলা উপন্যাসের প্রথম পর্যায়ে, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দেই বঙ্কিম বিধবার পূর্ণ সামাজিক বিবাহ দিয়ে তাকে হিন্দু গৃহে স্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন? রবীন্দ্রনাথে এই দ্বিধামুক্তি দেখা যায়নি 'চোখের বালি' উপন্যাসে; আর শরৎচন্দ্রতো এই বলিষ্ঠ মীমাংসার ধারে কাছে যাননি। তিনি বরঞ্চ গর্ব করেই বলেছেন পরবর্তী কালে—"আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিধবাদের পুনর্বিবাহে অনুমতি না দেওয়া স্ত্রী-জাতির প্রতি পুরুষ-জাতির অন্যায়ের জঘন্য দৃষ্টান্ত। সংসারের অনেক পাপ-তাপের এও একটা কারণ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে বিধবা-বিবাহ দেবার অনুমতির দায়িত্ব যখন আমার উপর আসে, তখন অন্তর থেকে সে অনুমতি আমি কিছুতেই দিতে পারিনে।"[১১] বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত মনোভাব সত্যই কি শরৎচন্দ্রের চেয়েও কঠোর? বিধবা-বিবাহের পরে কুন্দ সুখী হয়েছিল, তার আত্মহত্যা নগেন্দ্রের অবহেলা ও নিষ্ঠুরতায়, কোন পাপচেতনা থেকে অবশ্যই নয়। মৃত্যুকালে কুন্দর উক্তি, "কাল যদি তুমি আসিয়া এমনি করিয়া একবার কুন্দ বলিয়া ডাকিতে— কাল যদি একবার আমার নিকটে এমনি করিয়া বসিতে—তবে আমি মরিতাম না"[১২]—

তার জীবন ও প্রেমাকাঙ্ক্ষাকেই ফুটিয়ে তুলেছে। কুন্দ কোন পাপ করেনি, সেজন্য পাপবোধও নেই। সূর্যমুখীর কারণে যে অপরাধবোধ, তাকে পাপ-চেতনা বলা চলেনা। নগেন্দ্রনাথ যদি অবিবাহিত পুরুষ হতো, বঙ্কিমচন্দ্র কি কুন্দকে সর্বাঙ্গীন সুখী করতেন না? অথচ রবীন্দ্রনাথ এই বাধা না থাকা সত্ত্বেও বিহারী-বিনোদিনীকে বিবাহের মধ্যে সার্থক ও সুখী করেননি। শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের নীতিবাদের কঠোর সমালোচক হয়েও বিধবার সামাজিক বিবাহের ধারে কাছে যাননি। সমাজ সংসারের একান্তে বসে শরৎচন্দ্রের বিধবারা প্রেমিকের সেবা করেই নিজেদের কৃতার্থ জ্ঞান করেছে। এই তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেক আধুনিক ও প্রগতিশীল বলেই আমাদের মনে হয়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অবাধ বিধবা-বিবাহ দেখে যেতে পারেননি। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতিশীল মন্তব্যও উল্লেখ করা প্রয়োজন— "অতএব বিধবা বিবাহে অধিকারিণী বটে। কিন্তু এই নৈতিক তত্ত্ব অদ্যাপি এদেশে সচরাচর স্বীকৃত হয় নাই। যাঁহারা ইংরেজী শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের, বা ব্রাহ্ম ধর্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্যে পরিণত করেন না। তিনি, যিনি বিধবাকে বিবাহের অধিকারিণী বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহাদেরই গৃহস্থা বিধবা বিবাহার্থ ব্যাকুলা হইলেও, তাঁহারা সে বিবাহে উদ্যোগী হইতে সাহস করেন না। তাহার কারণ, সমাজের ভয়! তবেই, এই নীতি সমাজে প্রবেশ করে নাই। অন্যান্য সাম্যাত্মক নীতি সমাজে প্রবিষ্ট না হওয়ার কারণ বুঝা যায়; বিধানের কর্ত্তা পুরুষজাতি সে সকলের প্রচলনে আপনাদিগকে অনিষ্টগ্রস্ত বোধ করেন, কিন্তু এই নীতি কেন সমাজে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা তত সহজে বুঝা যায় না। ইহা আয়াস-সাধ্য নহে, কাহারও অনিষ্টকর নহে, এবং অনেকের সুখবৃদ্ধিকর। তথাপি ইহা-সমাজে পরিগৃহীত হইবার লক্ষণ দেখা যায় না। ইহার কারণ, সমাজে লোকাচারের অলঙ্ঘনীয়তাই বোধ হয়।"[১৩] বঙ্কিমচন্দ্র-উল্লেখিত এই অলঙ্ঘ লোকাচারই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে, বিদ্যাসাগরের বিধবাদের সুখী করার সকল মানবিক চেষ্টা হয়েছে পরাভূত। এই লোকাচার, সমাজের অনমনীয় মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বুঝেছিলেন,

তবু যুক্তিতে ও সহানুভূতিতে বিধবার বিবাহকে মেনে নিয়েছিলেন, এর মানবিক কারণ অস্বীকার করেননি। অবশ্য তাঁর প্রশংসার অর্থ ছিল সেই সব বিধবাদের প্রতি, যারা একনিষ্ঠ, দুঃখজয়ী। এই ধরনের উচ্চ চরিত্র-সম্পন্না রমণী সংসারে কয়জন? অল্পমাত্র। বাকী অধিক-সংখ্যক বিধবারা বিবাহ করুক, সংসার করুক, সুখী হোক, লোকাচারের নির্দেশ অমান্য করে— বঙ্কিমচন্দ্র তাই চেয়েছেন তার কালে।

'সাম্য' ১৮৭৯ সালে প্রকাশিত হয়। পরে 'সাম্য' আর পুনর্মুদ্রিত হয়নি। এ-প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বলছেন—"বঙ্কিম বাবু বলিলেন— 'একসময় আমার উপর মিলের বড় প্রভাব ছিল, এখন সে সব গিয়াছে।' নিজের লিখিত প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন 'সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।"[১৪] কিন্তু বঙ্কিমের বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত মতবাদের জন্য সাম্যের আলোচনা খুবই প্রয়োজন। অন্ততঃ বিধবা-বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনাই যে ভুল এমন কথা তিনি বলেননি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনার এক বৎসর পর তিনি 'সাম্য' রচনা করেন। বিধবা-বিবাহের বিরোধের কালে এটির প্রকাশ বঙ্কিমের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তেরই প্রমাণ বহন করে।

অনেকে মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস দুটি— 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)—বিধবা-বিবাহের বিরোধিতা করবার জন্যই রচনা করা হয়েছিল। এ ধারণা সত্য নয়। দুটি উপন্যাসেই বিধবার বিবাহ অপেক্ষা গভীরতর সমস্যা তিনি আলোচনা করেছেন। বঙ্কিম অনুভব করেছিলেন, স্বামীর মত স্ত্রীও একনিষ্ঠতা প্রত্যাশী। নগেন্দ্রনাথ বিধবা বিবাহ না করে কুমারী বিবাহ করলে সূর্যমুখীর অন্তর্দহন কম হতো কি? ভ্রমরের সমস্যা স্বামীর বিধবাগমন নয়, চরিত্রহীনতা। ভ্রমর স্বামীর ভালবাসা চায়, কিন্তু সেই সঙ্গে চায় স্বামীর পূর্ণ মনুষ্যত্বও। চরিত্রহীন স্বামীকে ভ্রমর ক্ষমা করে না। সুতরাং দুটি উপন্যাসেই বিধবার অপমৃত্যু, শোচনীয় পরিণাম দেখানো হয়েছে বলেই বিধবার বিবাহকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেননি, এমন ধারণা সঙ্গত নয়। ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্ব ও পরিবার-সমস্যা একটা সামগ্রিক রূপ নিয়ে দুটি উপন্যাসে, বিশেষ করে 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' প্রকাশ পেয়েছে, সঙ্কীর্ণ

মতবাদ প্রচারের প্রশ্ন সেখানে ওঠে না। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—"অনেক পাঠক আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন 'রোহিনীকে মারিলেন কেন?' অনেক সময়েই উত্তর দিতে বাধ্য হইয়াছি 'আমার ঘাট হইয়াছে'। কাব্যগ্রন্থ মনুষ্যজীবনের কঠিন সমস্যা সকলের ব্যাখ্যা মাত্র, এ কথা যিনি না বুঝিয়া, একথা বিস্মৃত হইয়া কোন গল্পের অনুরোধে উপন্যাস পাঠে নিযুক্ত হয়েন, তিনি এ সকল উপন্যাস পাঠ না করিলেই বাধিত হইব।"[১৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মাত্রই আদর্শ ছিল—সেটি উন্নত, উচ্চ জীবনের আদর্শ। ব্যক্তিগত জীবনাচরণে, স্বদেশ-স্বজাতির কল্যাণ-চিন্তায় এই আদর্শ সর্বদাই উজ্জ্বল ছিল। ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ চিত্ততা, মূঢ়তা, অশ্লীলতা, অসংযম, অশিক্ষা, লোভ বঙ্কিমের কাছে অধর্মেরই নামান্তর—সেখানে তিনি আপসহীন। চিন্তার এই উচ্চতা বঙ্কিমকে সাধারণ হিন্দুর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল অবশ্যই। তবু বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল ধ্যান-ধারণার প্রতিভূ বলে বিবেচিত হয়ে থাকেন। তার একটাই কারণ---তিনি নিজেকে সর্বদা সংশ্লিষ্ট রেখেছেন, তিনি জাতির যথার্থ উন্নতি চেয়েছেন; কর্মে, চরিত্রে, আকাঙ্ক্ষায় জাতিকে উচ্চ লক্ষ্যে পৌঁছাবার আন্তরিক চেষ্টায় সর্বদাই থেকেছেন একাগ্র। এই অর্থেই তিনি জাতির শিক্ষক, এই অর্থেই তিনি নিজ কালে হিন্দুর একমাত্র প্রতিনিধি। এই দায়িত্ব থেকে তাঁর পরিত্রাণ ছিল না, এই জন্যই সৃষ্টি-শীল সাহিত্যিক হয়েও তাঁকে সংশোধন ও সংরক্ষণের দায়িত্বও নিতে হয়েছে। মার্টিন লুথার কিং-এর মত তিনিও বলতে পারতেন—'By this I stand, I can not do otherwise'.

তথ্যসংকেত

১ 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার', দ্রষ্টব্য: বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পৃ. ২৫৩

২ বিনয় ঘোষ; বিদ্যাসাগর ও বাঙ্গালী সমাজ, পৃ. ২৪২-৪৩

৩ ঐ

৪ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ধর্মতত্ত্ব', ৫ম অধ্যায়, অনুশীলন

৫ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিম-প্রসঙ্গ, পৃ. ১৯৪

৬ 'উত্তর চরিত' (বিধিব প্রবন্ধ), বঙ্কিম রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, পৃ. ১৬০

৭ 'সাম্য', বঙ্কিম-রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, পৃ. ৪০০

৮ ঐ, পৃ. ৪০১-০২

৯ অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিম-মানস, পৃ. ৭৪-৭৫

১০ 'সাম্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০২

১১ নীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রের অংশ, দ্রষ্টব্য: নারায়ণ চৌধুরী, কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

১২ 'বিষবৃক্ষ', বঙ্কিম-রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, পৃ. ৩৪০

১৩ 'সাম্য', পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০২

১৪ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৮

১৫ অরবিন্দ পোদ্দার, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৫